বাংলাদেশে অর্পিত সম্পত্তির রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং আইনি কাঠামো

ভূমিকা

উত্তর-ঔপনিবেশিক দক্ষিণ এশিয়ায় সম্পত্তির অধিকার নিয়ন্ত্রক আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করলে রাষ্ট্র গঠন, সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতীয়তাবাদ এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর পদ্ধতিগত বেদখলের মধ্যে একটি গভীর আন্তঃসম্পর্ক দেখা যায়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতিতে এই যোগসূত্রের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ এবং স্থায়ী রূপ হলো অর্পিত সম্পত্তি আইন (Vested Property Act - VPA) এবং এর পূর্বসূরি শত্রু সম্পত্তি আইন (Enemy Property Act - EPA), ১৯৬৫[1]। প্রাথমিকভাবে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সামরিক শাসনতন্ত্র কর্তৃক যাদের "রাষ্ট্রের শত্রু" বলে গণ্য করা হতো–প্রধানত যেসব হিন্দু সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল–তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্য এই আইনি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছিল। বিস্ময়করভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বিলুপ্তির পরও এই আইনি কাঠামো টিকে ছিল[2]। যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন ও সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে, সেই রাষ্ট্রের তৈরি করা বৈষম্যমূলক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কাঠামো স্বাধীন দেশেও বাতিল করা হয়নি[3]। বরং, এই আইনটি একটি আভিধানিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়; এটি যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থা থেকে রূপান্তরিত হয়ে শান্তিকালীন সময়ে দেশের হিন্দু জনগোষ্ঠীকে কাঠামোগতভাবে ভূমিহীন করার একটি আমলাতান্ত্রিক হাতিয়ারে পরিণত হয়[2]।

এই বৈষম্যমূলক সম্পত্তি আইনের সংরক্ষণ, আত্তীকরণ এবং জোরালো প্রয়োগ বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক স্ববিরোধিতার প্রতিনিধিত্ব করে। যদিও জাতির মৌলিক পরিচয়টি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রাম এবং সাংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তবে অর্পিত সম্পত্তি আইনের বাস্তব প্রয়োগ একটি কাঠামোগত জবরদস্তির পরিবেশ তৈরি করেছিল। এর মাধ্যমে স্থানীয় রাজনৈতিক অভিজাত, আমলাতান্ত্রিক কর্মকর্তা এবং প্রভাবশালী ভূস্বামীদের একটি সর্বদলীয় চক্রের কাছে হিন্দু সংখ্যালঘুদের স্থাবর সম্পত্তি পদ্ধতিগতভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে[1]। এর ফলে যে জনমিতিক পতন ঘটেছে–১৯৫১ সালে প্রায় ২২ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৯ শতাংশেরও নিচে নেমে আসা–তা কেবল বিক্ষিপ্ত সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বা দেশভাগ-পরবর্তী অভিবাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়[4]। বরং, এটি রাষ্ট্র-সমর্থিত বেদখল ব্যবস্থার সরাসরি ও সুপরিকল্পিত পরিণতি, যা আইনি বৈধতা পেয়েছে, বিচারিক পর্যালোচনার বাইরে থেকেছে এবং স্থানীয় আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে[2]।

এই সন্দর্ভটি বাংলাদেশে অর্পিত সম্পত্তির রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং আইনি ইতিহাসের একটি সামগ্রিক তাত্ত্বিক, বিচারিক এবং গবেষণামূলক মূল্যায়ন প্রদান করে। ঔপনিবেশিক আমলের সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন থেকে শুরু করে সমসাময়িক অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পর্যন্ত আইনগত বিবর্তনের রূপরেখা তুলে ধরার মাধ্যমে, এই প্রতিবেদনটি একটি সমতাভিত্তিক সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে বৈষম্যমূলক বাজেয়াপ্তকরণ ব্যবস্থা বজায় রাখার সাংবিধানিক স্ববিরোধিতাগুলোকে উন্মোচন করে। তদুপরি, কার্ল মার্ক্সের আদিম সঞ্চয়ন (primitive accumulation), ডেভিড হার্ভের বেদখলের মাধ্যমে সঞ্চয়ন (accumulation by dispossession - ABD), মাইকেল লেভিয়েনের বেদখলের শাসনতন্ত্র (regimes of dispossession) এবং শেলি ফেল্ডম্যানের কাঠামোগত ভিন্নকরণ (structural othering) তত্ত্বের আলোকে এই গবেষণালব্ধ তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে, কীভাবে রাষ্ট্রীয় আইনি হাতিয়ারগুলোকে ব্যবহার করে নিজস্ব স্থানেই বাস্তুচ্যুতি (in-situ displacement) ঘটানো হয় এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে চিরতরে পরিবর্তন করা হয়।

আইন প্রণয়নের ইতিহাস এবং বিচারিক বৈপরীত্য

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দখলের আইনি কাঠামোটি ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের কোনো আকস্মিক সৃষ্টি ছিল না, বরং এটি ছিল নির্দিষ্ট জনমিতিক অংশকে কোণঠাসা করার জন্য একটি সুদীর্ঘ আইনি পরিকল্পনার চূড়ান্ত পরিণতি। অর্পিত সম্পত্তি আইনের বিবর্তন বোঝার জন্য এর পূর্ববর্তী আইনগুলোর ধারাবাহিক কালানুক্রম এবং সামরিক ও বেসামরিক সরকারগুলোর ব্যবহৃত পরিবর্তনশীল আইনি যুক্তিগুলো বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

১৯৬৫-পূর্ববর্তী পটভূমি এবং দেশরক্ষা বিধিমালা (Defence of Pakistan Rules)

পূর্ববঙ্গে রাষ্ট্র-সমর্থিত সম্পত্তি দখলের মৌলিক নজিরটি দেশভাগের পরপরই দ্বিজাতিতত্ত্বের আদর্শিক বাধ্যবাধকতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর শাসনামলে প্রণীত পূর্ববঙ্গ (জরুরি) সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) নবগঠিত পাকিস্তানি রাষ্ট্রকে তথাকথিত জনস্বার্থের অজুহাতে সম্পত্তি অধিগ্রহণের অবাধ ক্ষমতা প্রদান করেছিল[3]। এই প্রক্রিয়াটি পূর্ব পাকিস্তানে ভৌগোলিকভাবে আটকে পড়া হিন্দু জমিদার এবং শিক্ষিত অভিজাতদের বিরুদ্ধে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল[10]। মুসলিম শরণার্থীদের পুনর্বাসন এবং নতুন রাষ্ট্রের ভৌত অবকাঠামো সুসংহত করার নিরপেক্ষ আমলাতান্ত্রিক ভাষায় প্রণীত হলেও, এটি এমন একটি আইনি সংস্কৃতির সূচনা করেছিল যেখানে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তির অধিকারকে রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকারের অধীনস্থ বলে গণ্য করা হতো[6]।

নির্ণায়ক আইনি ফাটলটি তৈরি হয় ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সালে, সতেরো দিনব্যাপী পাক-ভারত যুদ্ধের সূচনার মধ্য দিয়ে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি দেশরক্ষা অধ্যাদেশের (১৯৬৫ সালের ২৩নং অধ্যাদেশ) অধীনে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন[5]। এই জরুরি কাঠামোর অধীনে সরকার দেশরক্ষা বিধিমালা (DPR) প্রণয়ন করে। এর ১৬১ এবং ১৬৯ বিধিতে 'শত্রু' হিসেবে এমন যেকোনো রাষ্ট্রকে সংজ্ঞায়িত করা হয় যারা পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত এবং সেই রাষ্ট্রে বসবাসকারী বা নাগরিকত্ব ধারণকারী যেকোনো ব্যক্তিকে বোঝানো হয়[5]। ১৮২ বিধির মাধ্যমে সরকার শত্রু সম্পত্তির কাস্টডিয়ান, ডেপুটি কাস্টডিয়ান এবং সহকারী কাস্টডিয়ান নিয়োগের ক্ষমতা পায়, যারা এই 'শত্রুদের' জমি, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং ভবনের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারত[2]।

পরবর্তীকালে, ১৯৬৫ সালের ৩ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নির্বাহী প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে নির্দেশ দেন যে, সমস্ত 'শত্রু সম্পত্তি' শত্রু সম্পত্তির ডেপুটি কাস্টডিয়ানের অধীনে ন্যস্ত হবে[2]। ১৯৬৬ সালের পূর্ব পাকিস্তান শত্রু সম্পত্তি (ভূমি এবং ভবন) প্রশাসন এবং নিষ্পত্তি আদেশের মাধ্যমে এটি আরও আনুষ্ঠানিকভাবে সম্প্রসারিত হয়[2]। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যদিও এর ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তানের স্বার্থের পরিপন্থী কাজে সম্পত্তির ব্যবহার রোধ করা, এর প্রয়োগ ছিল চরম বৈষম্যমূলক[2]। সরকার প্রচ্ছন্নভাবে সমস্ত হিন্দুকে জাতীয়তার তোয়াক্কা না করে সুপ্ত "শত্রু" হিসেবে চিহ্নিত করেছিল, এই প্রাতিষ্ঠানিক ধারণার ভিত্তিতে যে হিন্দুদের ভারতের প্রতি অন্তর্নিহিত সহানুভূতি রয়েছে[14]। ধর্মীয় পরিচয়ের সাথে জাতীয় নিরাপত্তার হুমকির এই একীভূতকরণই শত্রু সম্পত্তি আইনের মূল বিচারিক ভিত্তি গঠন করেছিল[6]।

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী রূপান্তর: 'শত্রু' থেকে 'অর্পিত'

১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ভূ-রাজনৈতিক এবং আদর্শিক প্রেক্ষাপটকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করে দেয়, যা শত্রু সম্পত্তি আইনের প্রেক্ষাপটকে আইনি, ঐতিহাসিক এবং নৈতিকভাবে বাতিল করে দেয়। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত প্রধান মিত্র ও আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করেছিল এবং নতুন দেশটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক নীতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল[4]। কিন্তু সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র তাদের সাবেক নিপীড়কদের দ্বারা নির্মিত বৈষম্যমূলক সম্পত্তি দখলের কাঠামো ভেঙে ফেলার পরিবর্তে, আইন বলবৎকরণ আদেশ ১৯৭১ (Laws of Continuance Enforcement Order)-এর মাধ্যমে নিজেদের আইনি কাঠামোর মধ্যে তা সম্পূর্ণভাবে আত্তীকরণ করে নেয়[3]।

১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ (সম্পত্তি ও সম্পদ অর্পণ) আদেশ (১৯৭২ সালের ২৯নং রাষ্ট্রপতির আদেশ) জারি করেন, যা কার্যকরভাবে পূর্ববর্তী পূর্ব পাকিস্তান শত্রু সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ডের পরিচালিত সমস্ত সম্পত্তি নতুন বাংলাদেশ সরকারের কাছে

হস্তান্তর করে[1]। এই রূপান্তরটি ১৯৭৪ সালে তার আইনি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। সরকার শত্রু সম্পত্তি (জরুরি বিধান অব্যাহত রাখা) (রহিতকরণ) আইন (১৯৭৪ সালের ৪৫নং আইন) পাস করে, যা যুদ্ধকালীন জরুরি বিধান বাতিল করে কিন্তু একটি নতুন নামকরণের অধীনে বাজেয়াপ্ত সম্পদের ওপর রাষ্ট্রকে নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার অনুমতি দেয়[1]। একই সময়ে অর্পিত এবং অনাবাসিক সম্পত্তি (প্রশাসন) আইন (১৯৭৪ সালের ৪৬নং আইন) আনুষ্ঠানিকভাবে "শত্রু সম্পত্তিকে" "অর্পিত সম্পত্তি" হিসেবে নতুন নামকরণ করে[1]।

'শত্রু' থেকে 'অর্পিত' শব্দের এই শব্দার্থিক পরিবর্তনটি ছিল আইনি ছলনার একটি গভীর দৃষ্টান্ত। এটি সক্রিয় সশস্ত্র সংঘাতের প্রেক্ষাপট থেকে সংখ্যালঘু জমি বাজেয়াপ্তকরণকে বিচ্ছিন্ন করে এবং শান্তিকালীন রাষ্ট্রের একটি স্থায়ী প্রশাসনিক কাজ হিসেবে এটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়[2]। আইনি কল্পকাহিনীটি এমনভাবে বজায় রাখা হয়েছিল যেন রাষ্ট্র অনাবাসিক নাগরিকদের জন্য একজন কল্যাণকামী রক্ষক হিসেবে কাজ করছে; তবে ১৯৭৬ সালে জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনামলে ১৯৭৬ সালের ৯৩নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইনগুলোকে সংশোধন করে রাষ্ট্রকে অর্পিত সম্পত্তির নিরঙ্কুশ মালিক হিসেবে ঘোষণা করা হয়[1]। নিখাদ মালিকানা দাবির মাধ্যমে রাষ্ট্র রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী সুবিধাভোগীদের কাছে ancestral হিন্দু জমি ইজারা দেওয়া, বিক্রি করা এবং স্থায়ীভাবে পুনর্বণ্টন করার ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নেয়, যা মূল সংখ্যালঘু মালিকদের তাদের স্বত্ব থেকে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করে।

সাংবিধানিক সাংঘর্ষিকতা এবং বিচারিক বৈপরীত্য

১৯৭২ সালে গৃহীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রেক্ষাপটে অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রয়োগ চরম বিচারিক স্ববিরোধিতা তৈরি করেছিল। সংবিধান স্পষ্টভাবে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয় এবং ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং সমতাভিত্তিক অধিকারকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

VPA-এর সংরক্ষণ বেশ কয়েকটি মূল সাংবিধানিক অনুচ্ছেদের সাথে গভীর ও অমিমাংসিত দ্বন্দ্ব তৈরি করে:

- **অনুচ্ছেদ ১১:** এই অনুচ্ছেদ নিশ্চিত করে যে প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা এবং মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে[15]। জাতি-ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে সম্পত্তির খেয়ালখুশিমতো বাজেয়াপ্তকরণ মানব মর্যাদার প্রতি একটি প্রত্যক্ষ অপমান।
- **অনুচ্ছেদ ১৩:** এই অনুচ্ছেদ মালিকানার নীতি প্রতিষ্ঠা করে, যা রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায় মালিকানা এবং ব্যক্তিগত মালিকানায় বিভক্ত। বৈধ নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি কোনো আইনি জনস্বার্থ ছাড়াই জোরপূর্বক রাষ্ট্রীয় মালিকানায় হস্তান্তরের মাধ্যমে VPA সম্পত্তির অধিকারের সাংবিধানিক ভারসাম্যকে বিকৃত করেছিল।
- **অনুচ্ছেদ ২৭:** এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। VPA এককভাবে হিন্দু সংখ্যালঘুদের লক্ষ্যবস্তু করেছিল, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপভোগ করা সমান সুরক্ষা থেকে তাদের বঞ্চিত করেছিল[6]।
- **অনুচ্ছেদ ২৮(১):** এই অনুচ্ছেদ স্পষ্টভাবে রাষ্ট্রকে কেবল ধর্ম, বর্ণ, জাত, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করতে নিষেধ করে। VPA-এর বাস্তব প্রয়োগ, যা জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে হিন্দুদের লক্ষ্যবস্তু করেছিল, তা ছিল বৈষম্যহীনতার এই ধারার সরাসরি লঙ্ঘন[11]।
- **অনুচ্ছেদ ৪২:** এই অনুচ্ছেদ সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর এবং বিলি-বণ্টন করার মৌলিক অধিকার রক্ষা করে এবং নিশ্চিত করে যে আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনো সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, জাতীয়করণ বা অধিগ্রহণ করা যাবে না।

অর্পিত সম্পত্তি আইনের ধারাবাহিকতা এই সাংবিধানিক নিশ্চয়তার একটি প্রত্যক্ষ ও দীর্ঘস্থায়ী লুণ্ঠন। রাষ্ট্র অর্পিত সম্পত্তির আইনগুলোতে বিচারিক পর্যালোচনা রহিতকারী ধারা (ouster clauses) যুক্ত করে বিচারিক তদন্ত এড়িয়ে যায়, যা কার্যকরভাবে দেওয়ানি আদালতকে সম্পত্তির শ্রেণিবিভাগের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে বা সম্পত্তি ফেরত পাওয়ার মামলা গ্রহণে বাধা দেয়[2]। এই কাঠামোগত বর্জন হিন্দু সংখ্যালঘুদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকত্বে নামিয়ে আনে, যেখানে তাদের সম্পত্তির অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠদের

মতো সাংবিধানিক সুরক্ষার পরিবর্তে স্থানীয় আমলাদের খেয়ালখুশির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে[6]। এর ফলে একটি সমান্তরাল আইনি জগত তৈরি হয় যেখানে একটি নির্দিষ্ট জনমিতিক গোষ্ঠীর জন্য সাংবিধানিক আধিপত্য স্থগিত করা হয়েছিল।

প্রশাসনিক প্রক্রিয়া এবং অভিজাতদের স্বার্থসিদ্ধি

লক্ষ লক্ষ একর ব্যক্তিগত জমিকে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত "অর্পিত সম্পত্তিতে" রূপান্তর করা কোনো নিষ্ক্রিয় আইনি প্রক্রিয়া ছিল না; এর জন্য একটি আক্রমণাত্মক এবং উচ্চ প্রণোদনাপ্রাপ্ত প্রশাসনিক কাঠামোর প্রয়োজন ছিল[2]। VPA-এর বাস্তবায়ন ব্যাপকভাবে ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থার স্থানীয় কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল ছিল, যা অভিজাতদের স্বার্থসিদ্ধি, পৃষ্ঠপোষক-মক্কেল বণ্টন এবং মূলধন সঞ্চয়নের প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে।

স্থানীয় আমলাতন্ত্রের ভূমিকা

বাজেয়াপ্তকরণ প্রক্রিয়াটি তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (তহসিলদার), থানা রাজস্ব কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে পরিচালিত হতো[2]। VPA-এর ব্যাপক অপব্যবহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক ছিল ১৯৭৭ সালে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা একটি নির্বাহী পরিপত্র, যা তহসিলদারদের নতুন সম্পত্তি চিহ্নিতকরণ, জরিপ এবং সেগুলোকে 'অর্পিত' হিসেবে তালিকাভুক্ত করার সুস্পষ্ট ক্ষমতা প্রদান করে।

এই স্থানীয় আমলাদের ক্রমাগত অর্পিত সম্পত্তির তালিকা সম্প্রসারণের জন্য প্রায়শই অনৈতিক আর্থিক এবং পেশাগত প্রণোদনা প্রদান করা হতো। কমিশনের ভিত্তিতে কাজ করে বা স্থানীয় প্রভাবশালীদের কাছ থেকে সরাসরি ঘুষ আদায় করে তহসিলদাররা নিয়মতান্ত্রিকভাবে দুর্বল হিন্দু পরিবারগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করত। জমি দখলের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সাধারণত প্রতারণা এবং বলপ্রয়োগের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি ধরণ অনুসরণ করত:

1. **খেয়ালখুশিমতো চিহ্নিতকরণ ও অংশীদারদের শোষণ:** তহসিলদাররা সম্পূর্ণ একটি সম্পত্তিকে অর্পিত হিসেবে তালিকাভুক্ত করত শুধুমাত্র এই কারণে যে একজন অংশীদার (যেমন, একজন ভাই বা আত্মীয়) ভারতে পাড়ি জমিয়েছিলেন[1]। এরপর রাষ্ট্র সম্পূর্ণ এস্টেটটি বাজেয়াপ্ত করে, বাংলাদেশে বৈধ এবং নিরবচ্ছিন্ন নাগরিক হিসেবে বসবাসকারী পরিবারের সদস্যদের অংশটুকুও ছিনিয়ে নিত[14]।
2. **জাল দলিল নিবন্ধন (বায়নাপত্র):** দুর্নীতিগ্রস্ত সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সাথে যোগসাজশে সুবিধাবাদী দখলদাররা জাল বিক্রয় দলিল, 'বায়নাপত্র' বা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি তৈরি করত এই দাবি করে যে, আসল হিন্দু মালিকরা দেশত্যাগের আগেই সম্পত্তিটি তাদের কাছে হস্তান্তর করে গেছে[13]।
3. **জোরজবরদস্তি, উচ্ছেদ এবং বিচারবহির্ভূত সহিংসতা:** স্থানীয় রাজনৈতিক পেশিশক্তি এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উদাসীনতার সুযোগে ভূমিদস্যুরা সহিংসতা, ভীতি প্রদর্শন এবং ক্রমাগত "শত্রু" আখ্যা দেওয়ার হুমকি ব্যবহার করে হিন্দু পরিবারগুলোকে তাদের বসতবাড়ি এবং কৃষিজমি ছেড়ে যেতে বাধ্য করত[8]। দখলদাররা প্রায়শই সশস্ত্র সন্ত্রাসী লেলিয়ে দিত, মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে হামলা চালাত বা ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করত যাতে মালিকদের অর্থনৈতিকভাবে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে[13]।

একবার কোনো সম্পত্তি অর্পিত হিসেবে তালিকাভুক্ত হলে জেলা প্রশাসকের একচেটিয়া ক্ষমতা থাকত জমিটি বছর বছর ইজারা দেওয়ার[10]। এই ইজারাগুলো বিপুলভাবে স্থানীয় রাজনৈতিক অভিজাত, প্রভাবশালী ভূস্বামী এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের দেওয়া হতো, যারা বাজারদরের চেয়ে অত্যন্ত কম মূল্যে জমিটি কৃষি বা বাণিজ্যিক উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করত। সময়ের সাথে সাথে, এই অস্থায়ী ইজারাগুলো কার্যত স্থায়ী মালিকানায় পরিণত হয়, কারণ ইজারাদাররা সম্পত্তিতে নিজেদের অবস্থান মজবুত করে ফেলে এবং রাষ্ট্র তাদের উচ্ছেদ করার কোনো রাজনৈতিক সদিচ্ছা দেখায়নি।

সর্বদলীয় স্বার্থসিদ্ধি এবং অভিজাতদের দখল

অর্পিত সম্পত্তি আইনের সুবিধাভোগীরা কোনো একক রাজনৈতিক আদর্শ বা প্রশাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; সংখ্যালঘু জমি দখল সমগ্র রাজনৈতিক বর্ণালী জুড়ে পৃষ্ঠপোষকতা বণ্টনের একটি কাঠামোগত মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছিল[1]। আত্মসাৎকৃত সম্পত্তির প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগীদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ওপর পরিচালিত গবেষণামূলক সমীক্ষাগুলো প্রমাণ করে যে, VPA-এর অপব্যবহারের ক্ষেত্রে সকল দলের মধ্যে একটি সর্বদলীয় মতৈক্য ছিল।

জমি দখলকারীদের রাজনৈতিক পরিচয়	সুবিধাভোগীদের শতকরা হার
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (AL)	৪৪.২%
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (BNP)	৩১.৭%
জাতীয় পার্টি (JP)	৫.৮%
জামায়াতে ইসলামী (JI)	৪.৮%
অন্যান্য/অসংশ্লিষ্ট	১৩.৫%

তথ্যসূত্র: অধ্যাপক আবুল বারকাতের গবেষণালব্ধ পরিসংখ্যান (২০০০)।

[cite: 1]

এই সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণের কালানুক্রমিক চিত্র এই প্রথার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণকে আরও সুস্পষ্ট করে। বারকাতের গবেষণা অনুসারে, পরিবার উচ্ছেদের প্রায় ৫৩ শতাংশ এবং জমি দখলের ৭৪ শতাংশ ঘটেছিল ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার আগে পাকিস্তানি শাসনামলে। তবে স্বাধীনতার পর সম্পত্তি আত্মসাতের সবচেয়ে বড় অংশটি ঘটে স্বাধীনতার পরপরই প্রথম আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে (১৯৭২-১৯৭৫) এবং পরবর্তী সামরিক ও বিএনপি সরকারের আমলে (১৯৭৬-১৯৮০)[1]।

এই শোষণের চক্রাকার প্রকৃতি ২০০১-২০০৬ সালের বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলেও স্পষ্ট দেখা যায়। এই সময়ের মধ্যে, মাত্র কয়েক মাস আগে পাস হওয়া একটি প্রত্যর্পণ আইনের আনুষ্ঠানিক অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও, আরও প্রায় ২ লাখ হিন্দু পরিবার তাদের জমি থেকে বঞ্চিত হয়, যা মোট জমি দখলের ঘটনার ৮ শতাংশ[2]।

এই তথ্যগুলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি ভয়াবহ বাস্তবতা তুলে ধরে: মোট জনসংখ্যার ০.৪ শতাংশেরও কম মানুষ শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন থেকে সরাসরি লাভবান হয়েছে[1]। এটি নির্দেশ করে যে এই আইনটি কখনোই ব্যাপকভিত্তিক ভূমি সংস্কার বা ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে সম্পদ পুনর্বণ্টনের হাতিয়ার হিসেবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল না। বরং, এটি ছিল সম্পূর্ণ বিচারহীনতার সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিকভাবে যুক্ত প্রভাবশালীদের দ্বারা অভিজাত সম্পদ দখল ও স্বার্থসিদ্ধির একটি সুনিপুণ প্রক্রিয়া[1]।

বেদখলের তাত্ত্বিক কাঠামো

রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠনের কাঠামোগত তত্ত্বগুলোর সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত না হলে অর্পিত সম্পত্তি আইনের বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। লক্ষ লক্ষ একর জমির এই পদ্ধতিগত হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটি মূলধন সঞ্চয়ন, স্থানিক পুনর্গঠন এবং সামাজিকভাবে প্রান্তিককরণের কাঠামোর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

আদিম সঞ্চয়ন এবং বেদখলের মাধ্যমে সঞ্চয়ন (ABD)

কার্ল মার্ক্সের "আদিম সঞ্চয়ন" (primitive accumulation) ধারণা–যা মূলত বিচারবহির্ভূত বলপ্রয়োগ, সহিংসতা এবং রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে উৎপাদককে উৎপাদনের উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া–VPA কে বোঝার জন্য মৌলিক তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করে[14]। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, VPA আদিম সঞ্চয়নের একটি চলমান প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক আইনি কাঠামো হিসেবে কাজ করেছে, যেখানে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত হিন্দু জমিগুলো দখল করতে এবং সেগুলো উদীয়মান মুসলিম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিজাতদের কাছে হস্তান্তর করতে তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছে[14]।

ডেভিড হার্ভে এই ধারণার তাত্ত্বিক সম্প্রসারণ করে তৈরি করেন "বেদখলের মাধ্যমে সঞ্চয়ন" (Accumulation by Dispossession - ABD), যা নির্দেশ করে যে আদিম সঞ্চয়নের প্রক্রিয়াগুলি কেবল পুঁজিবাদের প্রারম্ভেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এগুলো হলো পুঁজিপতি

রাষ্ট্রের অতি-সঞ্চয়ের (overaccumulation) সংকট সমাধান এবং শ্রেণিগত ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য ব্যবহৃত চলমান, ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। VPA হলো ABD-এর একটি ধ্রুপদী উদাহরণ[14]। রাষ্ট্র এই জমি কোনো বাজার প্রক্রিয়ায় বা ইচ্ছুক ক্রেতা-বিক্রেতা লেনদেনের মাধ্যমে অর্জন করেনি; রাষ্ট্র অত্যন্ত উৎপাদনশীল সম্পদ প্রায় বিনা মূল্যে বাজেয়াপ্ত করতে আইনি ফতোয়া, সাম্প্রদায়িক বিভাজন এবং আমলাতান্ত্রিক জবরদস্তিকে ব্যবহার করেছে[14]। বিপুল সম্পদের এই আকস্মিক মুক্তি সুবিধাভোগীদের জন্য দ্রুত মূলধন সঞ্চয়নের সুযোগ করে দেয়, যারা তাদের সদ্য অর্জিত কৃষি ও বাণিজ্যিক জমিগুলোকে তাদের নিজ নিজ এলাকায় বৃহত্তর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে কাজে লাগায়।

বেদখলের শাসনতন্ত্র এবং 'ভূমি-দালাল' রাষ্ট্র

মাইকেল লেভিয়েনের "বেদখলের শাসনতন্ত্র" (Regimes of Dispossession) তত্ত্বটি এই বিশ্লেষণকে আরও অগ্রসর করে। এটি আলোকপাত করে কীভাবে রাষ্ট্র নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জমি বাজেয়াপ্ত করার জন্য পদ্ধতিগতভাবে বিচারবহির্ভূত বলপ্রয়োগ ব্যবহার করে এবং এর ফলে স্বতন্ত্র কৃষিব্যবস্থা এবং প্রতিরোধের জন্ম দেয়[18]। যদিও লেভিয়েন প্রধানত ভারতের নিওলিবারাল বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) অধ্যয়নে এই কাঠামোটি প্রয়োগ করেছেন, তবে বাংলাদেশের VPA বোঝার জন্য এই ধারণাটি অত্যন্ত প্রযোজ্য এবং তাত্ত্বিকভাবে সমৃদ্ধ।

বাংলাদেশে VPA-এর অধীন "বেদখলের শাসনতন্ত্র" স্পষ্টভাবে নিওলিবারাল নয়, বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ-জাতীয়তাবাদী। লেভিয়েনের কাঠামোর অধীনে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র একটি "ভূমি-দালাল" (land broker) হিসেবে কাজ করে, কিন্তু বহুজাতিক পুঁজি বা শিল্প পার্কের জন্য জমি দালালি করার পরিবর্তে, এটি একটি প্রান্তিক জাতি-ধর্মীয় সংখ্যালঘুর কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে সরাসরি তার প্রভাবশালী রাজনৈতিক অনুসারীদের মধ্যে বিলি করে। এই শাসনতন্ত্র ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রের জবরদস্তিমূলক কাঠামো–পুলিশ, তহসিলদার, ম্যাজিস্ট্রেট এবং দেওয়ানি আদালতের বিচারিক আওতা রহিতকরণ–ব্যবহার করে সম্পদের ঊর্ধ্বমুখী পুনর্বণ্টন সহজতর করে[6]। VPA কাঠামোটি দেখায় যে কীভাবে উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র শুধুমাত্র শাসন করার জন্যই নয়, বরং নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর দেশত্যাগকে উৎসাহিত করে সংখ্যাগরিষ্ঠদের আনুগত্য পুরস্কৃত করার মাধ্যমে নাগরিকদের জনমিতিক ও অর্থনৈতিক রূপরেখা সক্রিয়ভাবে পরিবর্তন করতে আইনি প্রক্রিয়া ব্যবহার করে।

কাঠামোগত ভিন্নকরণ এবং নিজস্ব স্থানেই বাস্তুচ্যুতি (In-Situ Displacement)

উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিক এবং সমাজবিজ্ঞানী শেলি ফেল্ডম্যান "কাঠামোগত ভিন্নকরণ" (structural othering) এবং "নিজস্ব স্থানেই বাস্তুচ্যুতি" (in-situ displacement) ধারণার মাধ্যমে VPA-এর সবচেয়ে সুক্ষ্ম সমাজতাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান করেন[6]। ফেল্ডম্যান যুক্তি দেন যে পূর্ব বাংলা/পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে VPA একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। হিন্দুদের আইনগতভাবে "শত্রু" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে বা তাদের সম্পত্তির অধিকারকে খেয়ালখুশিমতো রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণের শর্তসাপেক্ষ করে, রাষ্ট্র সামাজিকভাবে হিন্দু নাগরিককে চিরস্থায়ী "ভিন্ন" (Other) হিসেবে চিত্রিত করে, যার আনুগত্য সবসময়ই সন্দেহের চোখে দেখা হয় এবং যার নিছক উপস্থিতিও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য প্রচ্ছন্ন হুমকি হিসেবে বিবেচিত হয়[8]।

এই চিত্রায়ণ তাদের সাংবিধানিক অধিকার সম্পূর্ণ স্থগিত করাকে বৈধতা দেয়[14]। ফেল্ডম্যান গুরুত্বপূর্ণভাবে উল্লেখ করেছেন যে VPA "নিজস্ব স্থানেই বাস্তুচ্যুতি" (in-situ displacement)-এর সুবিধা দেয়–এমন একটি অবস্থা যেখানে ব্যক্তিরা তাৎক্ষণিকভাবে শারীরিকভাবে স্থানান্তরিত না হয়েও তাদের অধিকার, সম্পত্তি এবং অস্তিত্বগত নিরাপত্তা থেকে বেদখল হয়ে পড়ে[7]। বাংলাদেশের হিন্দু নাগরিক কার্যত "ছায়া নাগরিক" বা দ্বিতীয় শ্রেণির প্রজাতে পরিণত হয়, যারা নিজেদের বাড়িতেই বাস করে কিন্তু অধিকারবঞ্চিত থাকে[8]। VPA-এর গভীর সহিংসতা কেবল পরিবারগুলোর নাটকীয় শারীরিক উচ্ছেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং রাষ্ট্রের "নৈমিত্তিক নিষ্ক্রিয়তা এবং অবহেলা"-র মধ্যেও নিহিত, যেখানে রাষ্ট্র স্থানীয় দখলদারদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে সক্রিয়ভাবে অস্বীকৃতি জানায়, যা তাদের অস্তিত্বকে কাঠামোগতভাবে অসহনীয় করে তোলে[7]। এই কপট আইনি পরিবেশ পরিবারগুলোকে গভীর দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয়, পারিবারিক বন্ধন ভেঙে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত দশকের পর দশক ধরে সম্প্রদায়ের নিরলস, দৈনন্দিন দেশত্যাগকে তরান্বিত করে[7]।

সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন এবং পদ্ধতিগত অন্তর্ঘাত

অর্পিত সম্পত্তি আইনের ঐতিহাসিক অবিচার সংশোধনের বিচারিক ও আইনি প্রচেষ্টা উচ্চ আদালতের সাংবিধানিক আদর্শবাদ এবং নির্বাহী বিভাগের মধ্যে প্রোথিত রাজনৈতিক অর্থনীতির মধ্যে একটি ধারাবাহিক ও প্রায়শই তিক্ত সংগ্রামকে উন্মোচন করে। যদিও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট মাঝে মাঝেই আইনের সবচেয়ে জঘন্য প্রয়োগগুলো সীমিত করতে হস্তক্ষেপ করেছে, কিন্তু যে আমলাতন্ত্রকে এটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারাই পদ্ধতিগতভাবে আইনি এবং প্রশাসনিক প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়াগুলোতে অন্তর্ঘাত চালিয়েছে।

বিচারিক হস্তক্ষেপ: 'বিনয় ভূষণ' এবং 'আবদুল হাই' ডকট্রিন

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী রায়ে VPA-এর পরিধি সীমিত করতে এবং নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করতে চেষ্টা করেছে। *আনন্দ মোহন কুন্ডু বনাম পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ* (১৯৬৮, ২০ ডিএলআর (এইচসিডি) ৯৭৬) মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করে যে, "কাস্টডিয়ান"-এর ভূমিকা কঠোরভাবে সম্পত্তিকে রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী কাজে ব্যবহার হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য, বাজেয়াপ্ত করার জন্য নয়[13]। এই নীতিটি পরবর্তীতে *বিনয় ভূষণ বনাম এসডিও, ব্রাহ্মণবাড়িয়া* (১৯৭৮, ৩০ ডিএলআর (এসসি) ১৩৯) নামক মৌলিক মামলায় সুদৃঢ় হয়[4]। আপিল বিভাগ শত্রু সম্পত্তির সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্কের মৌলিক প্রকৃতি স্পষ্ট করে রায় দেয় যে, মূল আইনটি "সম্পত্তির সুরক্ষা এবং ব্যবস্থাপনার চেয়ে বেশি কোনো অধিকার দেয় না"। রাষ্ট্র নিছক একজন রক্ষক বা কাস্টডিয়ান হিসেবে কাজ করেছিল; ফলস্বরূপ, রাষ্ট্র মালিকানা অর্জন করেনি, এবং জরুরি অবস্থা শেষ হওয়ার পর সম্পত্তি তার বৈধ মালিকদের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত। একইভাবে, *দুলিচাঁদ ওমরাওলাল বনাম বাংলাদেশ* (৩৩ ডিএলআর (এডি) ৩০) মামলায় আপিল বিভাগ অর্পিত সম্পত্তির যথেচ্ছ ইজারা দেওয়ার সীমাবদ্ধতাগুলো পুনর্ব্যক্ত করে[5]।

VPA-এর সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট বিচারিক ভর্ৎসনা ঘটে *মো. আবদুল হাই বনাম বাংলাদেশ সরকার* (৫৮ ডিএলআর (এডি) ১৭৭) মামলায়। এই রিট পিটিশনে, আবেদনকারী ১৯৭৬ সালের অধ্যাদেশের অধীনে নেওয়া পদক্ষেপের বৈধতা এবং ১৯৭৪ সালের পরে তালিকাভুক্ত সম্পত্তির আইনি বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করেন। হাইকোর্ট বিভাগ, যা পরবর্তীতে আপিল বিভাগ কর্তৃক বহাল রাখা হয়, রায় দেয় যে বাতিল হওয়া জরুরি আইনের অধীনে নেওয়া সমস্ত পদক্ষেপ অসাংবিধানিক। আদালত পর্যবেক্ষণ করে যে বাংলাদেশ পাকিস্তানের কোনো উত্তরসূরি রাষ্ট্র নয়, যার ফলে ১৯৭১ সালের পর "শত্রু" শব্দটি অব্যাহত রাখা একটি ঐতিহাসিক এবং আইনি ভুল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আদালত ঘোষণা করে যে ২৩ মার্চ ১৯৭৪ (যে তারিখে মূল জরুরি বিধানগুলো বাতিল করা হয়েছিল) এর পরে কোনো সম্পত্তিকে "শত্রু" বা "অর্পিত" হিসেবে তালিকাভুক্ত করা সম্পূর্ণ বেআইনি, অসাংবিধানিক এবং শুরু থেকেই বাতিল (void ab initio)[15]। "ইকুইটি সেটিই সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য করে যা সম্পন্ন হওয়া উচিত ছিল" - এই ন্যায়সঙ্গত নীতি প্রয়োগ করে, আদালত রাষ্ট্রকে এই ঐতিহাসিক অবিচার সংশোধন করার এবং অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮ এবং ৪২ এর অধীনে সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করার নির্দেশ দেয়।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন (২০০১) এবং এর সংশোধনীসমূহ

এই জোরালো বিচারিক নির্দেশনার পরও, ২০০১ সালের এপ্রিলে আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ দিনগুলোর আগ পর্যন্ত আইনগত অগ্রগতি সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ ছিল। ঐ সময় সংসদ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন (২০০১ সালের ১৬নং আইন) প্রণয়ন করে[1]। এই আইনটি তাত্ত্বিকভাবে মূল মালিক বা আইনি উত্তরাধিকারীদের কাছে অর্পিত সম্পত্তি ফেরত দেওয়া বাধ্যতামূলক করে এবং দাবি নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করে[10]।

তবে, ২০০১ সালের আইনটি তাৎক্ষণিকভাবে পদ্ধতিগত অন্তর্ঘাতের শিকার হয়। ২০০১ সালের শেষের দিকে সরকার পরিবর্তনের পর, নবগঠিত বিএনপি-নেতৃত্বাধীন জোট ২০০২ সালে একটি সংশোধনী পাস করে যা সরকারকে ফেরতযোগ্য সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের জন্য অনির্দিষ্টকালের সময় দেয়, যা কার্যকরভাবে সমগ্র প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়াকে হিমঘরে পাঠায়। এটি কয়েক বছরের একটি আইনি শূন্যতা তৈরি করে, যে সময়ে রাজনৈতিকভাবে যুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা বেআইনি বাজেয়াপ্তকরণ এবং সম্পত্তি হস্তান্তর প্রকৃতপক্ষেই ত্বরান্বিত হয়েছিল।

আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর ২০১১, ২০১২ এবং ২০১৩ সালের অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়াটি পুনরায় সক্রিয় হয়নি[2]। এই সংশোধনীগুলোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং বিতর্কিত কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য ছিল অর্পিত সম্পত্তিগুলোকে দুটি পৃথক তফসিলে (Schedule) বিভক্ত করা:

- **'ক' তফসিল (Schedule A):** এমন সম্পত্তি যা সরকারের বা তার তাৎক্ষণিক ইজারাদারদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং দখলে ছিল[26]।
- **'খ' তফসিল (Schedule B):** যে সম্পত্তিগুলো সরকার ইতিমধ্যে বিক্রি করে দিয়েছে, তৃতীয় পক্ষের কাছে স্থায়ীভাবে হস্তান্তর বা বিতরণ করেছে, অথবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ করেছে[3]।

প্রত্যর্পণ প্রচেষ্টায় একটি মারাত্মক ধাক্কা দিয়ে, সরকার পরবর্তীতে 'খ' তফসিলটি সম্পূর্ণ বাতিল করে দেয় এই সিদ্ধান্তে যে, যেসব সম্পত্তি ইতিমধ্যে তৃতীয় পক্ষের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে তা আইনগতভাবে ফেরতযোগ্য নয়[3]। এর যৌক্তিকতা হিসেবে দেখানো হয় যে বর্তমান দখলদারদের (যাদের অনেকেই রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী) মধ্যে ব্যাপক সামাজিক বিশৃঙ্খলা এড়ানো। এই শর্তটির অর্থ ছিল, লক্ষ লক্ষ একর অত্যন্ত মূল্যবান এবং দীর্ঘকাল আগে আত্মসাৎকৃত জমি স্থায়ীভাবে প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ার বাইরে চলে যায়, যা কার্যকরভাবে পূর্ববর্তী চুরিকে আইনি বৈধতা দেয়[2]।

অধিকন্তু, ট্রাইব্যুনালগুলো একটি কঠোর প্রামাণ্য মানদণ্ড আরোপ করে: "নিরবচ্ছিন্ন নাগরিকত্ব" (continuous and unbroken citizenship)-এর শর্ত। সম্পত্তি দাবি করতে হলে উত্তরাধিকারীদের প্রমাণ করতে হতো যে মূল মালিক এবং পরবর্তী সমস্ত উত্তরাধিকারী নিরবচ্ছিন্নভাবে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব এবং বসবাস বজায় রেখেছিলেন। যেহেতু EPA/VPA নিজেই ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং জোরপূর্বক স্থানান্তরের কারণ ছিল, তাই ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে রাষ্ট্রীয় সহিংসতার কারণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া পরিবারের নিরবচ্ছিন্ন বসবাসের প্রমাণ দাখিল করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

ট্রাইব্যুনালের অচলাবস্থা এবং প্রশাসনিক অবাধ্যতা

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের বাস্তবায়ন গুরুতর প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতার দ্বারা কলঙ্কিত হয়েছে। আইনে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আবেদনগুলো নিষ্পত্তি করার জন্য প্রতিটি জেলায় (পার্বত্য চট্টগ্রাম বাদে) বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিধান রাখা হয়েছিল[26]। তবে, মামলা নিষ্পত্তির হার ছিল অত্যন্ত হতাশাজনক। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর তথ্যানুযায়ী, ট্রাইব্যুনালগুলোতে এক লাখেরও বেশি মামলা বিচারাধীন রয়েছে, যা বিচার প্রক্রিয়াকে স্থবির করে দিয়েছে[28]।

এমনকি যখন দাবিদাররা জটিল আইনি প্রক্রিয়া সফলভাবে অতিক্রম করে তাদের জমি ফেরত দেওয়ার ট্রাইব্যুনালের ডিক্রি লাভ করে, তখনও স্থানীয় নির্বাহী আমলাতন্ত্র প্রায়শই তা বাস্তবায়নে বাধা দেয়। অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ALRD)-এর মতো অধিকারভিত্তিক সংস্থাগুলো নথিবদ্ধ করেছে যে জেলা প্রশাসক এবং স্থানীয় ভূমি কর্মকর্তারা প্রায়শই ট্রাইব্যুনালের আদেশ অমান্য করেন[28]। তারা বর্তমানে সম্পত্তিতে থাকা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের উচ্ছেদ এড়াতে প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি করে, ভিত্তিহীন আপিল করে, অথবা দাবি করে যে জমিটি অস্পষ্ট "জনস্বার্থে" প্রয়োজন[11]। যদিও হাইকোর্ট স্পষ্টভাবে সরকারি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন "রিট পিটিশন দায়েরের অজুহাতে বা অন্য কোনো অজুহাতে ট্রাইব্যুনালের ডিক্রি কার্যকর করতে কোনো বিলম্ব না করতে," স্থানীয় প্রশাসনের অবাধ্যতা এখনো একটি নিয়মিত ঘটনা, যা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আইনি বিজয়গুলোকে কেবল একটি প্রহসনে পরিণত করেছে[3]।

সামাজিক-জনমিতিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক সংশ্লেষণ

অর্পিত সম্পত্তি আইন নিছক কোনো আইনি অসঙ্গতি বা আমলাতান্ত্রিক ব্যর্থতা নয়; এটি সম্পদ হস্তান্তরের একটি বিশাল অর্থনৈতিক ইঞ্জিন যা বাংলাদেশের জনমিতিক গঠন এবং সামষ্টিক অর্থনীতিকে কাঠামোগতভাবে পরিবর্তন করেছে। এই ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের জন্য সামষ্টিক সম্পদের বঞ্চনা এবং এর সাথে সম্পর্কিত জনমিতিক ফলাফলগুলোর বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

প্রকৃত সম্পদের সামষ্টিক ক্ষতি

VPA-এর অর্থনৈতিক প্রভাবের সবচেয়ে বিশদ এবং প্রামাণ্য গবেষণামূলক রূপরেখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল বারকাত এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ALRD)-এর মতো সংস্থাগুলোর দ্বারা পরিচালিত হয়েছে[1]। তার দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট সম্পত্তি দখলের এক চমকপ্রদ ভয়াবহতা প্রকাশ করে।

বারকাতের ২০০০ সালের প্রাথমিক গবেষণা প্রকাশ করে যে ৭৪৮,৮৫০টি হিন্দু পরিবার ১.৬৪ মিলিয়ন একর কৃষিজমি থেকে বেদখল হয়েছে, যা বাংলাদেশের মোট জমির ৫.৩ শতাংশ[1]। তবে পরবর্তীকালে, আরও বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ এই পরিসংখ্যানগুলোকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে। ২০০৭ সালের মধ্যে, বারকাতের গবেষণা নির্দেশ করে যে প্রায় ১২ লক্ষ পরিবার–যা তৎকালীন দেশের মোট ২৭ লক্ষ হিন্দু পরিবারের ৪৪ শতাংশ–সরাসরি এবং গুরুতরভাবে এই আইন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে[10]। একই সাথে, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর (US Department of State) হিসাব প্রকাশ করে যে হিন্দুদের কাছ থেকে প্রায় ২৫ লক্ষ (২.৫ মিলিয়ন) একর জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাবের সূচক	গবেষণালব্ধ পরিসংখ্যান
ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার	১২ লক্ষ (১.২ মিলিয়ন)
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি	৬০ লক্ষ (৬.০ মিলিয়ন)
বাজেয়াপ্ত মোট জমি	২৫ থেকে ২৬ লক্ষ একর
হিন্দুদের মোট জমির কত অংশ হারানো গেছে	৫৩% থেকে ৬০%
মোট ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘু জনসংখ্যার অনুপাত	৭৫%

তথ্যসূত্র: আবুল বারকাত (২০০৭) এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর (২০০৫)। [cite: 1, 2, 8, 14]

হারিয়ে যাওয়া বিপুল পরিমাণ জমির পরিমাণ–প্রায় ২৬ লক্ষ একর–যার গভীর সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে। বারকাত হিসাব করেছেন যে বর্তমান বাজার মূল্যে, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির (স্থাবর এবং অস্থাবর উভয় সম্পদ মিলিয়ে) মূল্য ছিল প্রায় ২,৫২,০০০ কোটি টাকা (২০০৭ সালের দামের হিসাবে প্রায় ৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) ৭৫ শতাংশের সমতুল্য ছিল[9]।

এটি উত্তর-ঔপনিবেশিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সম্পদ হস্তান্তরের ঘটনাগুলোর একটি। হিন্দু সম্প্রদায়ের এই অর্থনৈতিক বিলোপ বাংলাদেশের প্রায় ৬০ শতাংশ হিন্দুকে কার্যত ভূমিহীন করে দিয়েছে, তাদের মূলধনের ভিত্তি ধ্বংস করে দিয়েছে, তাদের কৃষিভিত্তিক জীবিকার পথ বন্ধ করে দিয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে কাঠামোগত দারিদ্র্য ও চরম অরক্ষিত অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যাতাত্ত্বিক পতন

অর্পিত সম্পত্তি আইনের মাধ্যমে সংঘটিত অর্থনৈতিক বেদখল বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাতের দীর্ঘমেয়াদী পতনের সাথে প্রত্যক্ষ ও কার্যকরভাবে সম্পর্কিত[1]।

১৯৪৭ সালে, দেশভাগের আগে, হিন্দুরা পূর্ব বাংলার মোট জনসংখ্যার আনুমানিক ৩০ থেকে ৩৩ শতাংশ ছিল[1]। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি নাগাদ, দেশভাগের সহিংসতার ফলে এই হার ২২ শতাংশে নেমে আসে। ১৯৬৫ সালে শত্রু সম্পত্তি আইনের প্রাক্কালে, এটি আরও কমে ১৭ শতাংশে দাঁড়ায়[1]। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর এবং পরবর্তী শাসনকালগুলোতে VPA-এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ফলে জনসংখ্যার হার নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সালে ১০.৭ শতাংশে নেমে আসে এবং বর্তমানে এটি ৮ থেকে ৯ শতাংশের নিচে অবস্থান করছে[1]।

বারকাতের গবেষণাগুলো এই আইনি কাঠামোর বিশাল মানবিক মূল্যের রূপরেখা তুলে ধরে। তার তথ্যমতে ১৯৬৪ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে ১ কোটি ১৩ লক্ষ (১১.৩ মিলিয়ন) হিন্দু বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়েছে। এর অর্থ হলো বছরে প্রায় ২৩০,৬১২ জন মানুষ দেশত্যাগ করেছে, অর্থাৎ পাঁচ দশক ধরে প্রতিদিন গড়ে ৬৩২ জন মানুষ দেশ ছেড়েছে। EPA/VPA এই দেশত্যাগের প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। সম্পত্তির মালিকানাকে অন্তর্নিহিতভাবে অনিশ্চিত করে, খণ্ড খণ্ড বাজেয়াপ্তকরণের মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধন ভেঙে দিয়ে এবং দুর্বলতা ও ক্ষমতাহীনতার একটি সাধারণ পরিবেশ তৈরি করে, রাষ্ট্র কার্যকরভাবে এই আইনকে জনমিতিক সমজাতীয়তা (demographic homogeneity) নিশ্চিত করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে[13]।

উপসংহার

বাংলাদেশে অর্পিত সম্পত্তি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি রাষ্ট্র-সমর্থিত বেদখলের একটি দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ, যেখানে উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আইনি কাঠামো একটি অরক্ষিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তাদের অধিকার ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের ভূ-রাজনৈতিক শত্রুতার মধ্যে উৎপত্তি লাভ করা এই আইনটিকে পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারগুলো মূলধন সঞ্চয়ন এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার একটি কাঠামোগত প্রক্রিয়া হিসেবে নতুন রূপ দিয়েছে।

হিন্দু জনগোষ্ঠীকে সুনির্দিষ্টভাবে লক্ষ্যবস্তু এবং দখল করার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইনের পাশাপাশি একটি ধর্মনিরপেক্ষ, সমতাভিত্তিক সংবিধানের সহাবস্থান আইনের শাসনের চরম ব্যর্থতাকে তুলে ধরে। আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির সুরক্ষার সাংবিধানিক নিশ্চয়তাগুলো আইনগত ফতোয়া এবং আমলাতান্ত্রিক জবরদস্তির দ্বারা পদ্ধতিগতভাবে পদদলিত হয়েছে। তহসিলদারদের মতো দুর্নীতিগ্রস্ত স্থানীয় আমলাদের দ্বারা চালিত, জাল দলিলের মাধ্যমে পুষ্ট এবং রাজনৈতিকভাবে যুক্ত অভিজাতদের দ্বারা সুরক্ষিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়াটি প্রমাণ করে যে কীভাবে বিচারবহির্ভূত বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রের দৈনন্দিন শাসনব্যবস্থায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে একীভূত হতে পারে। আদিম সঞ্চয়নের তত্ত্ব এবং মাইকেল লেভিয়েনের 'ভূমি-দালাল' রাষ্ট্রের ধারণাটি সম্পদের এই বিশাল ঊর্ধ্বমুখী স্থানান্তরকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরে, যা হিন্দু সম্প্রদায়ের ২৬ লক্ষ একর জমি এবং ৫৫ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ কেড়ে নিয়েছে।

অধিকন্তু, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের অর্থবহ ক্ষতিপূরণ অর্জনে ব্যর্থতা এই বেদখলের সুবিধাভোগীদের প্রোথিত ক্ষমতাকেই আরও স্পষ্ট করে। নিরবচ্ছিন্ন নাগরিকত্ব সংক্রান্ত কঠোর প্রমাণাদি বাধ্যতামূলক করে, 'খ' তফসিলের জমির শক্তিশালী দখলদারদের সুরক্ষার জন্য তফসিল বিভক্ত করে এবং বিচারিক ট্রাইব্যুনালের নির্দেশকে অমান্য করার জন্য নির্বাহী আমলাতন্ত্রকে দায়মুক্তি দেওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্র এটি নিশ্চিত করেছে যে এই ঐতিহাসিক চুরি মূলত অমীমাংসিতই থেকে গেছে।

পরিশেষে, অর্পিত সম্পত্তি আইন সম্পত্তি আইনের নিছক একটি ঐতিহাসিক অধ্যায় নয়; এটি "নিজস্ব স্থানেই বাস্তুচ্যুতি" (in-situ displacement)-এর প্রধান চালিকাশক্তি যা সামাজিকভাবে হিন্দু নাগরিককে চিরস্থায়ী অরক্ষিত "ভিন্ন" হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। ১ কোটির বেশি মানুষের দেশত্যাগ এবং ১৯৫১ সালের ২২ শতাংশ থেকে জনসংখ্যা বর্তমানে ৯ শতাংশের নিচে নেমে আসা একটি জাতির জনমিতিক এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি পুনর্গঠনে আইনি সহিংসতা ব্যবহারের বিধ্বংসী সফলতার একটি অন্ধকার প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। এই কলঙ্কিত ইতিহাসের সমাধানের জন্য কেবল প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনালগুলোর জমে থাকা মামলাগুলো নিষ্পত্তি করাই যথেষ্ট নয়, বরং সেই গভীরভাবে প্রোথিত রাজনৈতিক অর্থনীতিকেও ধ্বংস করতে হবে যা আজও সংখ্যালঘুদের বেদখল থেকে মুনাফা লুটছে।

Works cited

1. Vested Property Act (Bangladesh) - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Vested_Property_Act_(Bangladesh)
2. Property Dispossession and the Exodus of Hindus in Bangladesh, https://www.fairobserver.com/region/central_south_asia/property-dispossession-and-the-exodus-of-hindus-in-bangladesh/
3. How Bangladesh govts 'legally' confiscated lands of Hindus since its, https://www.opindia.com/2024/09/from-enemy-property-act-to-vested-property-act-how-bangladesh-govts-legally-confiscated-lands-of-hindus-since-its-liberation-from-pakistan/
4. DEFINE VESTED PROPERTY ACT AND POLITICAL ECONOMY IN, https://www.lawyersnjurists.com/article/define-vested-property-act-and-political-economy-in-bangladesh/
5. The Vested Property Act of Bangladesh is a very controversial law of, https://laddu36.weebly.com/uploads/6/9/0/1/6901484/vested_property_laws_in_bd.pdf
6. The Hindu as Other: State, Law, and Land Relations in, https://journals.openedition.org/samaj/4111
7. "Legal" Land Appropriation as Sanctioned by the Vested Property, https://www.researchgate.net/publication/320363023_Legal_Land_Appropriation_as_Sanctioned_by_the_Vested_Property_Acts_Democracy_in_Practice
8. When will Bangladeshi Hindus get their properties returned?, https://myvoice.opindia.com/2023/04/when-will-bangladeshi-hindus-get-their-properties-returned/
9. Political Crisis in Bangladesh: It's Impact on Minorities ... - FINS India, https://finsindia.org/political-crisis-in-bangladesh-its-impact-on-minorities-and-concern-for-india.html
10. Critical_Analysis_of_the_Restor, https://www.calameo.com/books/0030342597df80cde6ca5
11. Human Rights Report | Bangladesh 2020, https://www.hinduamerican.org/projects/human-rights-report/bangladesh/
12. Property Rights in Bangladesh Legal Guide Uncovered, https://www.lawyersnjurists.com/article/rights-of-property-in-bangladesh/
13. Vested Property Laws and Minority Rights in Bangladesh - Scribd, https://www.scribd.com/presentation/857086528/VP-Law
14. Bangladeshi Hindus - Coveted Enemies under the Vested Property Act, https://www.asthabharati.org/Dia_Oct%2008/Rabin.htm
15. Equity in Md. Abdul Hye Case Analysis | PDF - Scribd, https://www.scribd.com/document/894475208/Equity-Assignment
16. Realizing the Right to Property under the Constitution of ... - Brill, https://brill.com/downloadpdf/edcollchap/book/9789004706477/BP000017.pdf
17. Orders of C.P.C. 1908 Bangladesh - The Lawyers & Jurists, https://www.lawyersnjurists.com/article/code-of-civil-procedure-1908-order-i-xlvii/
18. Land Dispossession | Michael Levien, https://mlevien.org/publications/
19. Dispossession without Development eBook by Michael Levien, https://it.kobo.com/us/en/ebook/dispossession-without-development-msa-c
20. Dispossession without Development: Land Grabs in Neoliberal India, https://dokumen.pub/dispossession-without-development-land-grabs-in-neoliberal-india-modern-south-asia.html
21. State, Law, and Land Relations in Contemporary Bangladesh, https://www.semanticscholar.org/paper/The-Hindu-as-Other%3A-State%2C-Law%2C-and-Land-Relations-Feldman/a9388ea7ed4e4932097629c79c36816021338001
22. The enemy property laws in Bangladesh: grabbing lands under the, https://www.researchgate.net/publication/283760236_The_enemy_property_laws_in_Bangladesh_grabbing_lands_under_the_guise_of_legislation
23. Words and Phrases [L, M, N] | The Lawyers & Jurists, https://www.lawyersnjurists.com/article/words-and-phrases-l-m-n/
24. 10 Scob 2018 | PDF | Judgment (Law) | Appeal - Scribd, https://www.scribd.com/document/739454134/10-SCOB-2018
25. Enemy Property Legislation in Bangladesh | PDF | State Of Emergency, https://www.scribd.com/document/901540205/Ms-Dulichand-Omraolal-vs-Bangladesh-Through-the-SeBDAD800016COM841294
26. 'Enemy Property' Cases: HC for quick settlement | The Daily Star, https://www.thedailystar.net/frontpage/enemy-property-cases-hc-quick-settlement-1556821
27. (PDF) Political Economy Analysis of the Role of the Judiciary in, https://www.researchgate.net/publication/355807577_Political_Economy_Analysis_of_the_Role_of_the_Judiciary_in_Land_Dispossession_Litigation_in_Bangladesh
28. Alrd | Association for Land Reform and Development :: HOME, https://alrd.org/news-events/105/25
29. Vested Property Act cases linger on | theindependentbd.com, https://theindependentbd.com/printversion/details/166643